গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ১৩ সংখ্যা | ৮ - ১৪ নভেম্বর ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

নভেম্বর বিপ্লব
বেকার সমস্যার পুঁজিবাদী অভিশাপকে দূর করেছিল

স্বাধীনতার পর থেকেই বেকার সমস্যায় জর্জরিত ভারতের যুবসমাজ। যত দিন যাচ্ছে, তা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে অনেকেই ভাবেন, বেকার সমস্যার কি সমাধান নেই! এটাই কি ভবিতব্য? অথচ এই দুনিয়াই দেখেছে এমন সমাজব্যবস্থা যা বেকার সমস্যার সমাধানের পথ দেখিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক সেই সমাজ গঠিত হয়েছিল ১৯১৭-র মহান নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাময়িক বিপর্যয় দেখে অনেকেই উল্লাসে মেতে বলেছিলেন, এতে সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা

ছয়ের পাতায় দেখুন

অর্থনীতির বহর নাকি বাড়ছে! তা হলে
মানুষের কেনার ক্ষমতা কমছে কেন?

বাজারে পাক খেতে খেতে দেখা অসীমবাবুর সঙ্গে। তিনিও দেখলাম ইতিমধ্যে বেশ কয়েক পাক খেয়ে ফেলেছেন। বললেন, কী কিনব মশাই, যা দাম জিনিসপত্রে হাতই দিতে পারছি না। কিন্তু খেতে তো হবে! বললাম, মশাই অবস্থা তো সবারই এক। সবজিতে হাত দিলে তো ছ্যাঁকা লাগার অবস্থা। চাল, আলু, সরষের তেলের দাম লাফিয়ে বাড়ছে। রোজগার তো বাড়ছে না। অসীমবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেমেয়েরা কী করছে? বললাম, মেয়েটা পাশ করে বসে আছে। ছেলেটা পাশ করে বসে থেকে থেকে সুইগি-জোমাটোর ডেলিভারি বয়ের কাজে ঢুকেছে। কতটুকু রোজগার! সংসার চালানোই কঠিন হয়ে পড়ছে। তিনি এ বার জিজ্ঞেস করলেন, তা মশাই, কাগজে যে নিয়মিত পড়ছি, আমাদের অর্থনীতির পরিমাণ নাকি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বছরে বছরে নাকি কত ট্রিলিয়ন করে বাড়ছে। আমরা নাকি ইউরোপের সব নামকরা দেশগুলোকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছি। তা কই, সেই সব ট্রিলিয়ন-ফিলিয়নের দেখা তো কোথাও পাচ্ছি না!

ভাবছিলাম, ট্রিলিয়ন কততে হয় ভেবে কী হবে! অন্তত চার-পাঁচটা পেট ভরানোর মতো বাজারটা ঠিকঠাক করতে পারার মতো টাকাও যদি পকেটে থাকত! খাবার জোগাড় করতেই নাভিশ্বাস উঠছে। এরপর ইলেকট্রিক বিল, চিকিৎসা খরচ, বাড়িভাড়া সব দিতে গেলে

দুয়ের পাতায় দেখুন

বাকি অপরাধীদের নাম কই, জবাব দাও সিবিআই

আর জি করে ডাক্তার-ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার তদন্ত দ্রুত শেষ করা, সমস্ত দোষীদের নাম চার্জশিটে যুক্ত করা সহ বিভিন্ন দাবিতে 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা'র ডাকে হাজার হাজার মহিলার সিবিআই দপ্তর ঘেরাও অভিযান। ৪ নভেম্বর। সংবাদ পাঁচের পাতায়

শান্তির ভেক ধরে যুদ্ধের সুযোগে মুনাফা শিকারে ব্যস্ত ভারতীয় পুঁজিও

ইউরোপে চলা যুদ্ধের অবসান চান তিনি, চান 'শান্তি'। বললেন— 'এটা যুদ্ধের সময় নয়।' তিনি আরও বললেন, ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আমরা সর্বদাই কথা চালিয়ে যাচ্ছি। উপস্থিত অপরজন বললেন, ২০২২-এর এপ্রিলে ইস্তানবুলে হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তির খসড়ার ভিত্তিতে আলোচনা করার জন্য তিনি সর্বদাই প্রস্তুত। দুই 'শান্তির দূতের' কী অপূর্ব কথোপকথন!

বক্তাদের চিনতে নিশ্চয়ই অসুবিধা হচ্ছে না! গত ২২ থেকে ২৪ অক্টোবর রাশিয়ার কাজান শহরে অনুষ্ঠিত মূলত ৯টি দেশ নিয়ে গঠিত ব্রিকস গোষ্ঠীর সম্মেলনের প্রাক্কালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনের এই কথাবার্তার মধ্যে একবারও যুদ্ধ থামাতে বলা হল কি? অবশ্যই না। সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার প্রধান পুটিন যদি তা নাও বলেন, শান্তির দূত হিসাবে পরিচয় দেওয়া নরেন্দ্র মোদিও তা স্পষ্ট করে উচ্চারণ করলেন না কেন?

বিষয়টা বোঝার জন্য পর পর কয়েকটি তথ্যকে সাজিয়ে নিয়ে দেখা যাক। জেনে রাখা ভাল, নরেন্দ্র মোদি ব্রিকস সম্মেলনে যাওয়ার কিছুদিন আগে গিয়েছিলেন ইউক্রেন ও পোল্যান্ডে। ইউক্রেনে গিয়ে তিনি তাদের পাশে থাকার কথা বলেছেন। এরপর তিনি আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপানের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে 'কোয়াড' সম্মেলন করেছেন। কোয়াডের মূল উদ্দেশ্য এশিয়ায় চিনের আধিপত্য রোখা। এ দিকে ব্রিকস গোষ্ঠীটি গড়ে উঠেছে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জি-৭ গোষ্ঠীর পাল্টা অর্থনৈতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরির বাসনায়। যার অন্যতম দুই স্তম্ভ রাশিয়া এবং চিন। এর সদস্য প্রথমে ছিল ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। পরে যোগ হয়েছে মিশর, ইথিওপিয়া, ইরান এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। এতে যোগ দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করে আছে সৌদি আরব সহ আরও ৩০টি দেশ। রাশিয়ার রাষ্ট্রপতির আহ্বানে অতিথি হিসাবে এমন বেশ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ব্রিকস সম্মেলনে উপস্থিতও ছিলেন। কার্যত এটা ছিল ইউক্রেন যুদ্ধের দায়ে মার্কিন সামরিক জোট ন্যাটোর দ্বারা রাশিয়াকে একঘরে করার চেষ্টার বিরুদ্ধে পুটিনের শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চ। অন্য দিকে ভারত। চিন, ইরান প্রত্যেকেরই স্বার্থ ছিল রাশিয়ার যুদ্ধের সুযোগে মুনাফা কুড়ানোর।

এই সম্মেলনে যাওয়ার আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি সমস্ত রকম সমর্থন দেওয়ার কথা

তিনের পাতায় দেখুন

গাজা ও ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে ৪ নভেম্বর দেশ জুড়ে যুদ্ধবিরোধী দিবস পালিত হয় এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকে। ছবি ঃ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা। আরও ছবি ৫ পাতায়

মানুষের কেনার ক্ষমতা কমছে কেন?

একের পাতার পর

তেল সাবান কেনার পয়সাটাও তো থাকবে না।

এই চিন্তাটা যে কতটা বাস্তব তা বোঝা যায় ভোগ্যপণ্যের বাজারের হাঁড়ির হাল দেখে। সমীক্ষা থেকে স্পষ্ট, খাবার থেকে তেল-টুথপেস্ট-বিস্কুট-সাবান-শ্যাম্পুর মতো রোজকার ব্যবহারের ভোগপণ্যের (এফএমসিজি) ব্যবহার গত ছয় থেকে নয় মাসে কমেছে। কমেছে মধ্যবিত্তের আয়ত্তের মধ্যে থাকা ফ্ল্যাট এবং স্কুটার-বাইকের বিক্রি। কমেছে সাধারণের আয়ত্তে থাকা স্মার্টফোনের বিক্রিও। বিপরীতে দেখা যাচ্ছে, বেড়েছে বিলাসবহুল ফ্ল্যাট এবং দামি গাড়ির বিক্রি। ঠিক তেমনই ৩০ হাজার টাকা দামের স্মার্ট ফোনের বিক্রি বেড়েছে এবং ৪৫ হাজার টাকার উপরেরগুলির বিক্রি বেড়েছে আরও বেশি। অর্থাৎ ধনী অংশের বাজারটি অটুট আছে শুধু নয়, বরং তা ক্রমশ বাড়ছে, কমেছে মধ্যবিত্তের কেনার পরিমাণ।

কিন্তু মধ্যবিত্তের কেনার পরিমাণ কমছে কেন? বাস্তবে স্বাধীনতার পর থেকে সব সরকারই, বিশেষত বর্তমান নরেন্দ্র মোদি সরকার যে নীতি নিয়ে চলছে তাতে আর্থিক অসাম্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে, গরিব হচ্ছে আরও গরিব। শুধু তা নয়, মধ্যবিত্তের একটা অংশ দ্রুত রোজগার তথা ক্রয়ক্ষমতা হারিয়ে নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্রে পরিণত হচ্ছে। তার কারণ, মধ্যবিত্ত মূলত চাকরি-নির্ভর। অথচ চাকরির বাজারের হাল খুবই খারাপ। নতুন চাকরি হচ্ছে না বললেই চলে। প্রধানমন্ত্রীর বছরে দু'কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি এখন তাঁকেই বিদ্রূপ করছে। যারা-বা চাকরি করছেন, তাঁদের বেশিরভাগেরই বেতন তেমন হারে বাড়ছে না, বরং মূল্যবৃদ্ধির হিসেব ধরলে কার্যত কমছে। যেটুকু চাকরি হচ্ছে তা সবই কম বেতনের এবং চুক্তিভিত্তিক। মূল্যবৃদ্ধি যে হারে ঘটছে, শিক্ষা-চিকিৎসার খরচ যে ভাবে বাড়ছে তাতে সংসার চালাতেই মানুষ হিমসিম খাচ্ছে। তার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে ভোগ্যপণ্য কেনার পরিস্থিতি থাকে না। তাতে ভোগ্যপণ্যে কেনার উপরেই কোপটা প্রথম পড়ে। স্বাভাবিক ভাবেই ভোগ্যপণ্যের বিক্রি কমছে।

এই যে বিপুল ভাবে বৈষম্য বাড়ছে, এর ফল কী হচ্ছে? এর ফলে অর্থব্যবস্থায় যে বৃদ্ধি ঘটছে, তার সর্বজনীন সুষম বণ্টন হচ্ছে না। সমৃদ্ধি সীমিত থাকছে মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যেই।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা যেখানে কমছে সেখানে জিনিসপত্রের দাম এমন লাফিয়ে বাড়ছে কেন? অনেক আগেই প্রকাশিত একটি তথ্য আবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর বিরল আচার্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন— গত পাঁচ বছরে আদানি গোষ্ঠী-সহ পাঁচটি শিল্পগোষ্ঠী অন্তত ৪০টি ক্ষেত্রে একচেটিয়া ক্ষমতা তৈরি করেছে। এর বাইরেও রয়েছে অন্য একচেটিয়া শিল্পগোষ্ঠীগুলি। এই একচেটিয়া ক্ষমতার মাধ্যমে বাজারে পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করছে মুষ্টিমেয় এই কয়েকজনই। এর ফলে তারা যথেচ্ছ দাম বাড়িয়ে অতি মুনাফা করছে। তাতে ক্রেতা কিছু কমলেও ভারতের মতো বিরাট জনসংখ্যার দেশে মধ্যবিত্তের উপরের দিকে থাকা অংশ এবং উচ্চবিত্ত অংশের ক্রেতাদের থেকেই তারা তাদের মুনাফা তুলে নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী আছে যা এই একচেটিয়া কোম্পানিগুলিই উৎপাদন করে। চড়া দাম দিয়েও সাধারণ মানুষ সেগুলি কিনতে বাধ্য হয়। ফলে অন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচে মানুষকে কাটছাঁট করতে হয়, যা তাদের জীবন-মানকেই নামিয়ে আনে। এই ভাবে বেকারত্ব, বেতন না বাড়ার সঙ্গে দামবৃদ্ধিও অসাম্যকে বাড়িয়ে তুলছে।

নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্ষমতায় বসার পর আদানি-আম্বানি সহ একচেটিয়া পুঁজি-গোষ্ঠীগুলিকে যে ভাবে রাষ্ট্রীয় মদত দিয়ে চলেছে তা নজিরবিহীন। রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ ও সম্পত্তি নির্বিচারে এই সব একচেটিয়া পুঁজির হাতে তুলে দিচ্ছে সরকার। পাশাপাশি শ্রম-আইন বদলে দিয়ে কিংবা স্রেফ আইনের খাতা বন্ধ করে দিয়ে যে ভাবে শ্রমিক শোষণের লাগামছাড়া সুযোগ করে দিচ্ছে, ব্যাপক করছাড় এবং ভরতুকির নামে পুঁজিপতিদের সামনে রাজকোষ উন্মুক্ত করে দিচ্ছে তাতে এই গোষ্ঠীগুলির ভাণ্ডারে পুঁজির পাহাড় জমছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যাপক দুর্নীতি। সরকারি নেতা-মন্ত্রীদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় দুর্নীতি সংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। অথচ দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগকেই সরকার পাত্তা না দিয়ে স্রেফ নীরবতার নীতি নিয়ে চলেছে। এরই ফল হিসাবে সরকারি মদতপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠী উল্কাগতিতে পুঁজির পাহাড় বানিয়ে চলেছে, এমনকি বিশ্ব-পুঁজিগোষ্ঠীর প্রথম সারিতে জায়গা করে নিয়েছে। তাই তো দেশের মোট সম্পদের ৪০ শতাংশেরও বেশি কেন্দ্রীভূত হয়েছে মাত্র ১ শতাংশ পুঁজিপতির ভাণ্ডারে। আর সমস্ত সম্পদের স্রষ্টা সমাজের নিচের তলার ৫০ শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে মাত্র ১ শতাংশ সম্পদ। উল্টো দিকে, শাসক দলের ভাণ্ডার ভরে দিচ্ছে এই গোষ্ঠীগুলি। আর সেই বিপুল অর্থভাণ্ডার থেকেই শাসকদলগুলি নির্বাচনে অঢেল খরচ করে নির্বাচনকে প্রভাবিত করে চলেছে। সরকারে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে মুষ্টিমেয় ধনকুবের পুঁজিপতিদের এই বেআইনি এবং অনৈতিক সম্পর্ককে পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা ইনাম দিয়েছেন ক্রোনিক্যাপিটালিজম তথা স্যাঙাৎতন্ত্র। পচে যাওয়া, প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠা পুঁজিবাদের বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী যুগে বিশ্ব জুড়েই এই স্যাঙাৎতন্ত্রের ছড়াছড়ি।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের বর্তমান সরকারটি যে আসলে পুঁজিপতি শ্রেণির অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত সরকার, পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করাই যে তার একমাত্র কাজ, তা মোদি সরকারের কার্যকলাপ থেকে জলের মতো পরিষ্কার। যারা এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটিকে গণতান্ত্রিক অর্থাৎ এখানে সকলের অধিকার সমান, এই মনে করে তৃপ্ত থাকেন, মোদি শাসন তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে গোটা ব্যবস্থাটির মধ্যে কোথাও জনস্বার্থ বলে কিছু নেই। মানুষ অনাহারে মরছে, বিনা চিকিৎসায় মরছে, অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাকছে, আর নরেন্দ্র মোদি সহ সরকারের মন্ত্রী-আমলা-উপদেষ্টার দল সোল্লাসে ঘোষণা করে চলেছেন— দেশ এগোচ্ছে, আমরা পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হচ্ছি, আমরা জাপান-জার্মানিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছি।

হ্যাঁ, দেশের আর্থিক উন্নতি তো হচ্ছেই! দেশের দেড়শো কোটি মানুষ উদয়াস্ত যে পরিশ্রম করছে, তার তো কিছু না কিছু ফল রয়েছে। কিন্তু সেই ফসল কাদের ভাণ্ডারে গিয়ে জমা হচ্ছে? সেই সম্পদের মালিক কারা? তার মালিক হচ্ছে মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দল। তাদের সম্পদবৃদ্ধিকেই দেশের সম্পদবৃদ্ধি বলে প্রচার করে চলেছে মোদি-বাহিনী। পুঁজিপতিদের অনুগত অন্য দলগুলিও তাই করছে। কিন্তু এই সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গে দেশের শ্রমিক-কৃষক-নিম্ন আয়ের মানুষ, মধ্যবিত্ত মিলে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, তাদের সম্পর্ক কী? একটা উন্নত অর্থনীতির দেশ মানে তো দেশের এই সাধারণ মানুষের জীবন-মানের উন্নতি হওয়া। তাদের শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থানের কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থা হওয়া। হয়েছে নাকি তা? হওয়া দূরের কথা, যতটুকু যা এতদিনে গড়ে উঠেছিল, সেটুকুও তলিয়ে যাচ্ছে।

আর এই সত্যটাই যাতে মানুষ ধরতে না পারে, জানতে না পারে, তার জন্যই তাদের ধর্মের আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখার চেষ্টা। উৎসবের নামে মাতিয়ে রাখার চেষ্টা। তার জন্যই ধর্মে-ধর্মে, বর্ণে-বর্ণে বিরোধকে পাকিয়ে তোলার চেষ্টা। যাতে তারা সমস্ত শোষিত মানুষের মূল শত্রু পুঁজিবাদকে, পুঁজিপতি শ্রেণিকে চিনতে না পারে, যাতে তারা শোষিত মানুষের অন্য একটি অংশকেই শত্রু বলে মনে করে।

দেড়শো বছরেরও বেশি সময় আগে শোষণ-মুক্তির দিশারি মহান কার্ল মার্ক্স দেখিয়ে গিয়েছিলেন যে, পুঁজিবাদের স্বাভাবিক আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছে। ধার করা আয়ু নিয়ে সে টিকে আছে। শোষিত মানুষ, শ্রমিক শ্রেণি যে মুহূর্তে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন হবে এবং তার ভিত্তিতে সংগঠিত হবে, সে মুহূর্তে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। কিন্তু যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টিগুলির যথেষ্ট শক্তির অভাবে এবং মালিক শ্রেণির সহায়তায় সোস্যাল ডেমোক্রেটিক শক্তিগুলি, যা শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপসকামী শক্তি, সেগুলির প্রভাব শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে টিকে থাকার কারণে পুঁজিবাদ আজও অবাধ লুণ্ঠন চালিয়ে যাচ্ছে। একদিকে সোস্যাল ডেমোক্রেসিকে পরাস্ত করা, অন্য দিকে বিপ্লবী তথা যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে অতি দ্রুত শক্তিশালী করার মধ্য দিয়েই একমাত্র শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা সম্ভব।

চরম দারিদ্রের কবলে বিশ্বের ১১০ কোটি মানুষ

সেই কবে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন সমাজের সব হারানো মানুষদের কথা— 'নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনও দিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত কিছু থেকেও তাঁদের কেন কোনও কিছুতেই অধিকার নেই।' রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে, ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা'। একদিন সমাজে ধনী-গরিবের বৈষম্য দূর হবে, সমস্ত মানুষ সুস্থ জীবনের অধিকার পাবে, স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁরা। কিন্তু আজ প্রায় এক শতক পার করে বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে একেবারে প্রথম দিকে উঠে আসছে ভারতবর্ষ। গোটা বিশ্বেই বাড়ছে সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা, টিকে থাকার মরণপণ যুদ্ধই যাদের জীবনের একমাত্র সত্য।

বহুমাত্রিক দারিদ্র সূচকে (মাল্টি ডাইমেনশনাল পভার্টি ইনডেক্স) দারিদ্র মাপা হয় পুষ্টি, শিক্ষা, পানীয় জল, বাসস্থান, রান্নার জ্বালানি সহ সুস্থ জীবনযাত্রার জন্য আবশ্যিক মোট দশটি বিষয়ের ভিত্তিতে। এর মধ্যে অন্তত তিনটি থেকে যারা বঞ্চিত, এই সূচক অনুযায়ী তাঁরাই দরিদ্র বলে বিবেচিত হবেন। ইউনাইটেড নেশন'স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সংস্থা এই বহুমাত্রিক দারিদ্র সূচকের যে সাম্প্রতিক তালিকা তৈরি করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের ১১০ কোটি মানুষ তীব্র দারিদ্রের শিকার, যার অর্ধেকেরও বেশি আঠেরোর গণ্ডি পেরোয়নি। একশো দশ কোটি অর্থাৎ সর্বোচ্চ জনসংখ্যার দেশ ভারতের মোট জনসংখ্যার চেয়ে খুব বেশি পিছিয়ে নেই পৃথিবীর 'অতি দরিদ্র' মানুষের সংখ্যা। বিশ্বের ৮৩ কোটি মানুষের যথাযথ শৌচাগার ব্যবহারের সুযোগ নেই, ৮৯ কোটির কোনও ঘরবাড়ি নেই, প্রায় ১০০ কোটির কাছে পৌঁছায় না রান্নার জ্বালানি, এমন সব তথ্য উঠে এসেছে এই সমীক্ষায়।

দারিদ্রে ধুঁকতে থাকা মানুষের প্রায় অর্ধেক আছেন মাত্র পাঁচটি দেশে, যার মধ্যে ভারত একেবারে প্রথম— এ দেশে এমন মানুষের সংখ্যা ২৪.৪ কোটি। বাকি ভারতীয়রা, যারা এই সূচকে 'অতি দরিদ্র' তালিকার বাইরে রয়ে গেলেন, তাঁরা কেমন 'সুখে' আছেন, আন্দাজ পাওয়া যায় আরেকটি সাম্প্রতিক তথ্যে চোখ রাখলে। দেশের প্রায় ৬০ শতাংশ সম্পদ আছে ওপরতলার ১ শতাংশের হাতে, প্রায় ৮০ শতাংশ সম্পদ আছে ওপরের ১০ শতাংশের হাতে, আর নিচের তলার ৫০ শতাংশের হাতে রয়েছে মোট সম্পদের মাত্র ৩ শতাংশ। অর্থাৎ যাদের রক্ত জল করা পরিশ্রমে গড়ে উঠছে সম্পদের পাহাড়, তারাই পড়ে আছে সমাজের একেবারে তলানিতে। তাঁদের জন্য কাজ নেই, কাজ থাকলেও ন্যূনতম সুরক্ষা নেই। তাঁদের পুষ্টিকর খাদ্য নেই, রোগ হলে চিকিৎসা নেই, ভদ্রস্থ একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, শিক্ষার সুযোগ নেই। প্রতিদিনের কাগজ খুললেই এই মানুষগুলোর দেখা পাওয়া যায় অজস্র টুকরো খবরে। কেউ খিদের জ্বালায় সন্তানকে বেচে দিচ্ছেন, কেউ অসুস্থ পরিজনকে খানাখন্দে ভরা রাস্তা দিয়ে দড়িতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বহু মাইল দূরের হাসপাতালে, কেউ কাজ হারিয়ে বা ঋণের দায়ে সপরিবারে আত্মহত্যা করছেন। আরও কত মানুষ কত ভাবে যে দারিদ্রসীমার নিচে নেমে যাচ্ছেন, কত শিশু-কিশোরের ভবিষ্যৎ তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে, তার হিসাব নেই।

যুদ্ধ-সংঘর্ষের সাথে দারিদ্রের সম্পর্কের জরুরি তথ্যও উঠে এসেছে এই সমীক্ষায়। বিশ্বের ১১২টি দেশের ওপর করা এই সমীক্ষার তথ্য বলছে, ১১০ কোটি দরিদ্র মানুষের ৪৫.৫ কোটিই বাস করেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত, সংঘর্ষে দীর্ণ দেশগুলোয়। 'সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সংঘর্ষ বেড়ে গেছে বহুগুণ, অজস্র মানুষের প্রাণহানি

সাতের পাতায় দেখুন

মুনাফা শিকারে ব্যস্ত ভারতীয় পুঁজিও

একের পাতার পর

জানিয়েছেন প্যালেস্টাইনের গাজায় গণহত্যা চালানো ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীকে, অন্য দিকে প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার পক্ষেও তিনি কথা বলেছেন। বেশ জটিল ব্যাপার না? এই মুহূর্তে যে পক্ষগুলির মধ্যে যুদ্ধ চলছে তাদের সকলের সাথেই মোদিজি আলাদাভাবে কথা বলছেন এবং তাদের বিশেষ দাবিকে সমর্থন জানাচ্ছেন। অর্থাৎ বিপরীত স্বার্থবাহী যুদ্ধরত সব পক্ষের দিকেই তিনি আছেন! এমন কাজ যারা করে, তাদের বাংলা প্রচলিত বচনে যা বলা হয় সেটি না হয় উহ্যই থাক। কূটনীতি তো আর প্রচলিত বচন দিয়ে চলে না, তা চলে দেশের পুঁজিপতিদের ব্যবসায়িক স্বার্থের প্রয়োজন দিয়ে।

এর সঙ্গে আর একটি তথ্য জানা দরকার— নরেন্দ্র মোদি তথা বিজেপি পরিচালিত সরকারের সাহায্যে ভারতীয় ধনকুবেরদের মালিকানায় চলা প্রিমিয়ার এক্সপ্লোসিভস, আদানি ডিফেন্স অ্যান্ড অ্যারোস্পেস লিমিটেড, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা মিউনিশনস ইন্ডিয়া লিমিটেড প্রভৃতি কোম্পানি ইজরায়েলে এমন অস্ত্র পাঠাচ্ছে যেগুলি প্যালেস্টাইনে গণহত্যা চালানোর কাজে লাগছে। আরও জানা গেছে, ইউক্রেন তাদের সৈন্যবাহিনীর জন্য যে গোলা ব্যবহার করছে তার বেশ কিছু অংশ ভারতীয় কোম্পানির তৈরি (দ্য হিন্দু, ১৭.০৯.২৪ এবং রয়টার্স ১৯.০৯.২৪)।

যদিও, প্রধানমন্ত্রী কাজান থেকে ফিরে আসার পর ২৫ অক্টোবর ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন, ভারত যুদ্ধে নিরপেক্ষ নয়, শান্তির পক্ষে। একই দিনে তিনি সংসদের বিদেশ দপ্তর সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সামনে বলেছেন, ইজরায়েলে ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত। ৩০ হাজার ভারতীয় শ্রমিক সেখানে কাজ করছেন। আরও ৯ হাজার শ্রমিক দুই দেশের বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ইজরায়েলে গেছেন। এর সাথে পড়ুন আরও একটি তথ্য, রাশিয়া ভারতীয় শ্রমিকদের ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাজে নামিয়েছে বলে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের সূত্রই কিছুদিন আগে জানিয়েছে। হইচই হতে ভারত সরকার বলেছিল, তারা রাশিয়ার সাথে কথা বলে এই শ্রমিকদের যুদ্ধের কাজ থেকে মুক্ত করবে। জানা যাচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ভারতীয় কোম্পানি ইয়ন্ত্রা, বেসরকারি কোম্পানি মিউনিশনস ইন্ডিয়া, কল্যাণী স্ট্র্যাটেজিক সিস্টেমস প্রভৃতি সংস্থা ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় ২০২২-এর ফেব্রুয়ারি থেকে '২৪-এর জুলাইয়ের মধ্যে ১৩৫.২৫ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম চেক রিপাবলিক, ইতালি, স্পেন এবং স্লোভানিয়াতে পাঠিয়েছে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিফেন্স স্টাডিজের বিশেষজ্ঞ আরজান তারাপোর দেখিয়েছেন, এর আগে দু বছরে মাত্র ৩ মিলিয়ন ডলারের কম মূল্যের অস্ত্র ভারত থেকে এই দেশগুলোতে গেছে। তাঁর মতে, এই অস্ত্র ইউক্রেনের যুদ্ধে ব্যবহার করার ফলেই এর চাহিদা বেড়েছে। রয়টার্স দেখাচ্ছে, অস্ত্র রপ্তানির অনুমোদনহীন একটি ইতালিয়ান কোম্পানি 'এমইএস' যে এই অস্ত্র ইউক্রেনে পাঠাচ্ছে তা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের অজানা ছিল না। এমনকি রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি ইয়ন্ত্রার এক পূর্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন ২০২৩ অর্থবর্ষে অনামা যে কোম্পানিটির সাথে ইয়ন্ত্রার ব্যবসার নথি তাদের বার্ষিক আর্থিক রিপোর্টে দেওয়া হয়েছে সেটি হল গোপন অস্ত্র রপ্তানিতে যুক্ত এমইএস। এই তথ্য ইয়ন্ত্রা এবং এমইএস কেউই সরাসরি স্বীকার না করলেও অস্বীকারও করেনি। সেজন্যই বিপুল হারে রপ্তানি বাড়িয়েছে ভারতীয় কোম্পানিগুলি। কাস্টমসের তথ্যও এই মতকে সমর্থন করে (রয়টার্স, ১৯.০৯.২৪)। প্রসঙ্গত, অস্ত্র রপ্তানির ক্ষেত্রে অবশ্যপালনীয় শর্ত থাকে যে দেশ অস্ত্র কিনছে তা একমাত্র তারাই ব্যবহার করবে। এর অন্যথা ঘটলে, অস্ত্র অন্য কোনও পক্ষকে তারা বিক্রি করলে বা অন্যভাবে সরবরাহ করলে রপ্তানিকারক দেশের কর্তব্য তা পাঠানো বন্ধ করে দেওয়া। ভারত সরকার এই আন্তর্জাতিক কর্তব্যটি করেনি কেন? ভারতীয় ধনকুবেরদের অস্ত্র ব্যবসাটি অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদেই নয় কি? এ দিকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে মার্কিন সরকার ১৯টি ভারতীয় কোম্পানিকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে রাশিয়াতে যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহের অভিযোগে। অর্থাৎ ভারতীয় পুঁজিপতিরা যুদ্ধরত দুই দেশকেই অস্ত্র ও সরঞ্জাম বেচছে। ৩০ আগস্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছিলেন, ভারত গত আর্থিক বছরে ২.৫ বিলিয়ন ডলারের (এক বিলিয়ন ১০০ কোটি) অস্ত্র রপ্তানি করেছে। ২০২৯-এর মধ্যে তা বছরে ৬ বিলিয়ন ডলারে তা নিয়ে যেতে চান তাঁরা। এর সঙ্গে ইজরায়েল এবং রাশিয়া দুই প্রান্তের দুই যুদ্ধক্ষেত্রেই ভারতীয় শ্রমিকদের পাঠানো কী দেখাচ্ছে— ভারতীয় শাসকরা যুদ্ধ টিকিয়ে রাখার পক্ষে, না বন্ধ করার দিকে?

কী স্বার্থ ভারতীয় শাসকদের? যে স্বার্থে মার্কিন শাসকরা ইজরায়েলের যুদ্ধে মদত দিচ্ছেন, তা আরও নানা দেশে ছড়িয়ে পড়তে কার্যত সাহায্য করছেন। ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করে চলার জন্য মার্কিন কর্তারা তাদের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোটকে কাজে লাগিয়ে কোনওমতেই যুদ্ধবিরতি হতে দিতে রাজি নয়। একই ভাবে রাশিয়া এবং ব্রিটেন-জার্মানি-ফ্রান্সের মতো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যুদ্ধে ইন্ধন দিচ্ছে নিজ নিজ স্বার্থে। এরা প্রত্যেকেই তাদের অস্ত্র ভাণ্ডার যেমন খালাস করতে চাইছে তেমনই চাইছে কৃষ্ণসাগর, ভূমধ্যসাগর, সহ পুরো বাণিজ্যপথে নিজেদের আধিপত্য। ইউক্রেনকে সামনে রেখে মার্কিন সামরিক জোট ন্যাটোর বিস্তৃতি চাইছে তারা। চাইছে বিশ্বের তেলসমৃদ্ধ এলাকায় আধিপত্য বজায় রাখতে।

একইভাবে রাশিয়া চাইছে ন্যাটোর পাল্টা সামরিক জোট গড়তে। সমাজতন্ত্র ত্যাগ করে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে নাম লেখানো চিন চাইছে 'বেল্ট অ্যান্ড রোড'-এর মতো পরিকাঠামোর মধ্য দিয়ে নিজেদের আধিপত্য বাড়ানোর কাজে এই অস্থিরতাকে ব্যবহার করতে। ঠিক একইভাবে ভারতীয় শাসক পুঁজিপতি শ্রেণিও যুদ্ধ জিইয়ে রাখতে আগ্রহী। যুদ্ধই যদি না থাকে তাহলে ভারতীয় ধনকুবেরদের তৈরি অস্ত্র কিনবে কে? যদিও এটিই সব নয়, স্বার্থ আরও আছে— ভারতীয় পুঁজিপতিরাও ভারত থেকে মধ্যপ্রাচ্য, ইজরায়েল হয়ে ইউরোপে সহজ বাণিজ্য পথ তৈরি ও তাতে আধিপত্য চায়। ফলে ইজরায়েলের আক্রমণ নিয়ে তারা চুপ থাকে।

তা হলে, ভারতীয় শাসকরা নিরপেক্ষ নয়, শান্তির পক্ষে— এ কথা কি সত্যি? একেবারেই নয়। সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি আমেরিকা, মার্কিন নেতৃত্বে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের জোট ন্যাটো কিংবা রাশিয়ার মতো ভারতও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হিসাবে যুদ্ধের পক্ষে। অন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মতো তারও শত্রু-শান্তি। ইউক্রেন এবং প্যালেস্টাইনের যুদ্ধ ভারতীয় ধনকুবেরদের অস্ত্র ব্যবসাকে চাঙ্গা করেছে। তেমনই, রাশিয়ার থেকে সস্তায় তেল নিয়ে তা শোধন করে দেশীয় এবং ইউরোপের বাজারে চড়া দামে বেচে বিপুল মুনাফা করছে ভারতীয় পুঁজিপতিরা। ভারতীয় শাসক শ্রেণি যথার্থই শান্তির পক্ষে থাকলে যুদ্ধ থেকে মুনাফা তোলার জন্য চুপ করে না থেকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ ধ্বনিত করত। বলত, যুদ্ধের ফলে একটি মৃত্যুও আমরা মানব না। তারা কখনওই তা বলেনি।

যুদ্ধ পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অস্তিত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা লেনিন দেখিয়েছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের জন্ম দেয়। কোনও ভূখণ্ড দখলের থেকেও বর্তমান যুগে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে মূল লক্ষ্য হল বাজারের দখল। বাজার নিয়ে কাড়াকাড়ি এবং পরস্পরের মধ্যে বাজারের ভাগ বাঁটোয়ারার জন্যই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দেশগুলির শাসকরা পরস্পরের বিরুদ্ধে দুটি বিশ্বযুদ্ধ লড়েছে। এছাড়াও অসংখ্য ছোট ছোট আঞ্চলিক যুদ্ধেও তারা এ কারণেই লড়েছে। আজকের যুগে যুদ্ধে এমনকি জয় পরাজয় সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়, যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য অর্থনৈতিক। বিশ্বসাম্যবাদের মহান নেতা স্ট্যালিন দেখিয়েছিলেন, পুঁজিবাদী দেশগুলো শিল্পের সংকট কাটানোর জন্য অর্থনীতির সামরিকীকরণ ঘটিয়েছে। যুদ্ধ তাদের প্রয়োজন অর্থনীতিকে সংকট থেকে বাঁচানোর জন্যই। যতদিন সমাজতান্ত্রিক শিবির বিশ্বে ছিল ততদিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রচারমাধ্যম বলত সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপরীতে 'গণতান্ত্রিক' (অর্থাৎ পুঁজিবাদী) দেশগুলির দ্বন্দ্বের ফলেই বিশ্বে যুদ্ধের বিপদ বর্তমান। সমাজতান্ত্রিক শিবির না থাকলে আর যুদ্ধের বিপদ থাকবে না। আজ সমাজতান্ত্রিক শিবির নেই, অথচ যুদ্ধের বিপদ বাড়ছে। যুদ্ধ যে পুঁজিবাদী দেশগুলির বাজার নিয়ে কাড়াকাড়ির পরিণামেই ঘটে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের অন্যান্য বিশ্লেষণের মতোই যুদ্ধ সংক্রান্ত এই বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ কতটা সঠিক তা আজকের পরিস্থিতি দেখিয়ে দিচ্ছে।

> "ইউক্রেন এবং প্যালেস্টাইনের যুদ্ধ ভারতীয় ধনকুবেরদের অস্ত্র ব্যবসাকে চাঙ্গা করেছে। তেমনই, রাশিয়ার থেকে সস্তায় তেল নিয়ে তা শোধন করে দেশীয় এবং ইউরোপের বাজারে চড়া দামে বেচে বিপুল মুনাফা করছে ভারতীয় পুঁজিপতিরা। ভারতীয় শাসক শ্রেণি যথার্থই শান্তির পক্ষে থাকলে যুদ্ধ থেকে মুনাফা তোলার জন্য চুপ করে না থেকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ ধ্বনিত করত। বলত, যুদ্ধের ফলে একটি মৃত্যুও আমরা মানব না। তারা কখনওই তা বলেনি।

মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতীয় শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি পুঁজিবাদী অর্থে দুর্বল দেশগুলির ওপর আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাদের সাথে নানা জোট-ব্লক তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যে বাজার দখলের আকাঙ্ক্ষায় ভারতীয় বুর্জোয়ারা তখন থেকেই কখনও বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের সাথে বোঝাপড়া করেছে কখনও তাদের সাথে দ্বন্দ্বে গেছে। তিনি ১৯৬২ সালেই দেখিয়েছেন— 'প্রতিটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের এবং সেই অর্থে ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ঝোঁক সুপ্ত রয়েছে— যা পুঁজিবাদী অর্থনীতির মধ্যেই নিহিত' (সময়ের আহ্বান)। তিনি দেখিয়েছিলেন, যত দিন যাচ্ছে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা প্রকট হচ্ছে। আরও দেখিয়েছেন, 'মিলিটারি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে সংকুচিত আভ্যন্তরীণ বাজারের কৃত্রিম তেজিভাব বজায় রাখার এবং ভারতবর্ষের সামরিক শক্তিকে বাড়িয়ে তোলার প্রয়োজনেই ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি যত দীর্ঘ সময় সম্ভব চিনের সাথে সীমান্ত সমস্যা, পাকিস্তানের সাথে কাশ্মীর সমস্যা এবং অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের সাথে তার নানান বিতর্কিত বিষয়কে জিইয়ে রাখার পথে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক যে অর্থনীতির সংকট যত তীব্র হবে, জনসাধারণের দৃষ্টিকে অন্যত্র সরিয়ে দিতে এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে শাসক শ্রেণি তত বেশি করে এই সব বিষয় নিয়ে হইচই করবে' (ওই)।

এই শিক্ষার আলোয় ভারতের বর্তমান শাসকদের আচরণ মিলিয়ে দেখলে কী বোঝা যাচ্ছে? ব্রিকস সম্মেলনে তারা রাশিয়ার সাথে বসে ডলারের বদলে টাকা বা রুবলে বাণিজ্যের জন্য মাথা ঘামিয়েছে। যুদ্ধের ফলে রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞার সুযোগে সস্তায় পাওয়া তেল কী ভাবে ভারত এবং চিন উভয়েই সহজে পেতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করেছে। যে কারণে এই বৈঠকের একেবারে পূর্ব মুহূর্তে হঠাৎ করেই নরেন্দ্র মোদি ও শি জিন পিং একত্রে বসে চিন-ভারত সীমান্ত বিরোধে আপাতত বিরতির বার্তা দিয়েছেন। তার কিছুদিন আগেই মার্কিন কর্তাদের সাথে বসে কোয়াড গোষ্ঠীর বৈঠকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চিনের আধিপত্য রোখার ব্যাপারে তারা ছক কষেছে। আবার এই সময়ের মধ্যেই পাকিস্তানে গিয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রী সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের সম্মেলনে চিন, রাশিয়া সহ কাজাখস্তান, ইরান, বেলোরুশের মতো দেশের সাথে বৈঠক করে বাণিজ্যের চেষ্টা করেছেন। এরা সকলেই শান্তির বাণী দেয়, কিন্তু আস্তিনে লুকোনো থাকে তীক্ষ্ণ ছুরি। সুযোগ পেলেই একে অপরকে আক্রমণ করে। কখনও সরাসরি যুদ্ধে, কখনও বাণিজ্যযুদ্ধের মধ্য দিয়ে।

ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদী থাবা বসাচ্ছে। ফলে নানা দেশে ভারতীয় এই পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সাধারণভাবে ভারত বিরোধী বিক্ষোভ হিসাবে সামনে আসছে। এশিয়ার প্রায় সব প্রতিবেশী দেশের জনগণের মধ্যে ভারতীয়

সাতের পাতায় দেখুন

বেতন বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার চা শ্রমিকরা

উত্তরবঙ্গের চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' দাবি উঠছে। ওখানেও কি আর জি কর হাসপাতালের মতো ধর্ষণ ও হত্যার মতো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে? এগুলি সব জায়গার মতো চা-বাগানেও কমবেশি আছে। এ ছাড়া আছে শ্রমিকদের অভাব অনটনের সুযোগ নিয়ে নারী পাচারের সমস্যা। প্রতি বছর বাগান থেকে বহু মেয়ে পাচার হয়ে যায়। বাগান যখন বন্ধ থাকে তখন ভিন রাজ্যে কাজ দেওয়ার নামে মেয়েদের নিয়ে যায় আড়কাঠিরা। তারপর সেই হতভাগ্য মেয়েগুলি বিক্রি হয়ে যায়। হাত বদল হতে হতে শেষে ঠাঁই হয় পতিতাপল্লীতে। এ সব দীর্ঘকাল ধরে চললেও এবং এই ঘটনাগুলো ক্ষোভের তীব্রতা বাড়ালেও উই ওয়ান্ট জাস্টিস সার্বজনীন স্লোগান হিসেবে আগে উঠে আসেনি। যদিও মানুষের ক্ষোভের মধ্যে জাস্টিস তথা ন্যায়বিচার পাওয়ার আকুতি ছিল। আর জি কর আন্দোলন সেই সুপ্ত আকুতিকে ভাষায় ব্যক্ত করেছে।

চা বলয়ে এই দাবির কেন্দ্রবিন্দু হল মালিকের লাগামছাড়া বেতন-বঞ্চনা ও বেতন-বৈষম্য। চা বাগানে শ্রমিকদের ন্যূনতম কোনও বেতন কাঠামো নেই। চা শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন স্থির করতে ২০১৫ সালে সরকার একটি কমিটি গড়েছিল। আজ অবধি সেই কমিটি একটিও সুপারিশ প্রসব করেনি।

১৯৯২ সালে পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনের সুপারিশ মানলে চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি হওয়ার কথা দৈনিক ৬০০ টাকার বেশি। কিন্তু কোনও ভাবেই ওই পরিমাণ মজুরি শ্রমিকদের দেওয়া হয় না। কত কম দেওয়া হয়? তথ্য বলছে, দৈনিক ৩৫০ টাকার মতো তাদের কম দেওয়া হয়। এটাকেই বলে শ্রম-চুরি। গড়ে ২৫০ টাকার বেশি পায় না শ্রমিকরা। অর্থাৎ এমনিতেই শ্রমিক যা মূল্য উৎপাদন করে তার একটা ভগ্নাংশ মাত্র মালিক তাকে দেয়। চা বাগানে পুরো ৬০০ টাকা দিলেও পুরো ন্যায্য মজুরি শ্রমিক পেত না। এটাই অর্থনীতির ভাষায় আন-পেইড লেবার অর্থাৎ না দেওয়া মজুরি। এই মজুরিই মালিকের মুনাফার উৎস। তার ওপর এই লুট শ্রমিককে একেবারে পথে বসানোর ব্যবস্থা করেছে। পিএফ একটি শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প। এটাকেও মালিকরা ব্যবহার করছে শ্রম চুরির হাতিয়ার হিসেবে। কী ভাবে? সে কথাই বলেছেন কার্সিয়াং-এর এক শ্রমিক গীতা রাউত। তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, শ্রমিকদের যতটুকু মজুরি দেওয়ার কথা সেখান থেকে দৈনিক ৩০ টাকা কেটে নেওয়া হয়। কিন্তু সেই টাকা পিএফ ফান্ডে জমা পড়ে না। গীতা দেবী জানালেন, তাঁর নিজের বাগানে পনেরো কোটি টাকা পিএফ ফান্ড বকেয়া।

সর্বোচ্চ মুনাফা করার লক্ষ্য থেকে শ্রমিকের শ্রম চুরির বহু উপায় মালিকরা বের করেছে। আগে চা বাগানের শ্রমিকরা যে শ্রম দিয়ে সম্পদ তৈরি করে, সেই শ্রমের মূল্যের একটি অংশ কিছু বস্তুগত সুবিধার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের দেওয়া হত। যেমন শ্রমিকদের রান্নার জ্বালানি দেওয়া হত। চা পাতা দেওয়া হত। ছাতা-চপ্পল দেওয়া হত। এগুলো সব বন্ধ। শ্রমিকদের কোয়ার্টার মেরামতির দায়িত্ব ছিল মালিকের। সেটাও মালিক করছে না। অসুস্থ হলে অ্যাম্বুলেন্সের সুযোগ ছিল। সেটাও এখন ৫০০ টাকা না দিলে মেলে না। এগুলি না দিয়ে মালিক তার মুনাফার অঙ্ক বাড়িয়ে চলেছে। এরই প্রতিক্রিয়ায় শ্রমিকদের অভাব, অর্থনৈতিক সঙ্কট ক্ষোভের জন্ম দিয়ে চলেছে।

শ্রমিকদের দাবি, কাজ করব সবটা। টাকা সবটা পাব না কেন? ন্যায্য প্রশ্ন। কিন্তু এর উত্তর কোথায়? খোঁজ নিলে দেখা যাবে, কেন্দ্র বা রাজ্যের শাসক দল, তাদের মদতপুষ্ট দুর্নীতিগ্রস্ত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, মালিক এবং একদল আড়কাঠি মিলে চা বলয় জুড়ে এক মারাত্মক অশুভ চক্রের জন্ম দিয়েছে। এ রাজ্যের পূর্বতন সরকারগুলির আমলেও এ জিনিস চলেছে। এখন তা একেবারে লাগামছাড়া হয়ে উঠেছে। একদিকে পুঁজিবাদী নিয়মেই শোষিত হওয়া, অন্যদিকে এই চক্র। একে ভাঙতে হলে সঠিক রাজনৈতিক শক্তিকে খুঁজতে হবে শ্রমিকদের।

গবেষণার সুযোগ সংকুচিত করছে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি

২৭-২৯ নভেম্বর নয়া দিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে দশম সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন। এই সম্মেলন নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার ডাক দেওয়া হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি শিক্ষার উপর বহুবিধ আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। যেমন উচ্চশিক্ষায় গবেষণার সুযোগ সংকোচন। যদিও এই শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, "বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলিতে গবেষণার উপর কম জোর দেওয়া হয় এবং প্রতিযোগিতামূলক কর্পোরেট রিসার্চ ফান্ডিংয়ের অভাব রয়েছে" (জাতীয় শিক্ষানীতি, ৯.২.এইচ., পৃষ্ঠা ৩৩)। অর্থাৎ বেসরকারি শিক্ষা-ব্যবসায়ী ধনকুবের গোষ্ঠীর ফান্ডিং-ই পারে দেশের গবেষণা ক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যা দূর করতে। সোজা কথায় সরকার দেশের উচ্চশিক্ষায় ফান্ডিং না করে, সেই ঘাটতি মেটাতে বেসরকারি কোম্পানিগুলিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে।

সরকারি নীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, প্রথমত আইআইটি, আইআইএসইআর-এ গবেষণা করার ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন ফেলোশিপ এবং স্কলারশিপ যথা মৌলানা আজাদ ন্যাশনাল ফেলোশিপ ফর মাইনরিটিস, সংখ্যালঘুদের জন্য প্রাক-মাধ্যমিক স্কলারশিপ বাতিল করা হয়েছে। তৃতীয়ত, বিভিন্ন ফান্ড বা অনুদান ছাঁটাই করে 'ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন' (এনআরএফ) গঠন করে তাকেই প্রধান ফান্ডিং সংস্থা করা হয়েছে। চতুর্থত, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির উপর জিএসটি ৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে। পঞ্চমত, পঞ্চগব্য, জ্যোতিষশাস্ত্র, সরস্বতী নদী সন্ধান, সংস্কৃত ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা ইত্যাদি অপবিজ্ঞান বা অনৈতিহাসিক বিষয়ে প্রভূত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। ষষ্ঠত, গবেষণা ক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ-শিক্ষা সংস্থায় যে নিজস্ব প্রবেশিকা ব্যবস্থা ছিল তার অবসান ঘটিয়ে সিইউইটি বা নেট-এর মতো কেন্দ্রীয় প্রবেশিকা চালু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার অস্বীকার করা হয়েছে। সপ্তমত, স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স) পর্বে পিএইচডি-র সমকক্ষ দ্বিতীয় কোনও ডিগ্রি রাখা যাবে না এই অজুহাত দিয়ে এম-ফিল কোর্স বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অষ্টমত, গবেষকদের সাপ্তাহিক চার থেকে ছয় ঘণ্টা বাধ্যতামূলক শিক্ষণ বা অন্যের গবেষণা-কাজে সাহায্যদানের নির্দেশ দিয়ে তাদের উপর বোঝা চাপানো হয়েছে ইত্যাদি।

এর পাশাপাশি, ইউজিসি খসড়া 'ইন্সটিটিউট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান, ২০২২'-এর মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত কমানোর পরিকল্পনা করেছে। গত বছর (২০২৩) জুন মাসে বিজেপি নেতৃত্বাধীন হরিয়ানা সরকার রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে 'স্ব-নির্ভর' ঘোষণা করে ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আর্থিক দায় অস্বীকার করে। তীব্র প্রতিবাদের পর সরকার ওই পরিকল্পনা থেকে পিছিয়ে আসে। কিন্তু হরিয়ানা সহ সকল রাজ্যে এটাই সরকারের লক্ষ্য। এমনকি, শিক্ষা সম্প্রসারণের নামে কলেজগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনমুক্ত (ডিসঅ্যাফিলিয়েন্ট) করে স্নাতক পর্বের পরেই পিএইচডি শুরু করার পথ খোলা হয়েছে। এতে গবেষণার মান কী হবে সেটা সহজেই অনুমেয়।

বহু প্রচারিত এনআরএফ-এর অবস্থা কী? এনআরএফ সংস্থাকে শুধুমাত্র পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য ৫০,০০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। অর্থাৎ বছরে মাত্র ১০,০০০ কোটি টাকা। এই অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। এনআরএফ-এর গঠন দেখলে স্পষ্ট হবে যে এটি শাসক দলের অঙ্গুলিহেলনে চলবে এমন একটি আমলাতান্ত্রিক সংস্থা যার কাঠামো সরকার ও কর্পোরেট—যৌথ অংশীদারিত্বে গঠিত হবে। এর গভর্নিং বডির সভাপতি হবেন প্রধানমন্ত্রী এবং দু'জন সহসভাপতির একজন হবেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী, দ্বিতীয় জন শিক্ষামন্ত্রী। বাকি সদস্যরা হয় আমলা, আর না হয় কোনও সংস্থার সচিব। ২৫ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন নানা ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি। মাত্র দু'জন সদস্য বিজ্ঞানীদের মধ্য থেকে এবং একজন সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হবেন। ফলে এটা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যে এই ফান্ডিং সংস্থা কাদের স্বার্থ দেখবে।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে এনআরএফ-এর ৭০ শতাংশ অর্থ আসবে প্রাইভেট সেক্টর থেকে। ফলে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় আগামীতে বেসরকারি সংস্থার হাত যে দীর্ঘ হবে সেটি খুব স্পষ্ট। ওই নীতিতে বলা হয়েছে সরকারি এবং বেসরকারি দুই ধরনের সংস্থাই সমানভাবে এনআরএফ-এর গ্রান্ট বা মঞ্জুরি পাবে। সোজা কথায় এর ফলে জনগণের ট্যাক্সের টাকা বেসরকারি মালিকের পকেটে ঢুকবে।

মোদি সরকার দেশের মানুষকে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'-র স্বপ্ন দেখাবে, 'মেক-ইন-ইন্ডিয়া' স্লোগান তুলবে, আর বাস্তবে অর্থ বরাদ্দের সময় মুঠো খুলবে না। গবেষণায় অর্থের ঘাটতির কথা বলে দেশের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে। দেশ-বিদেশের পুঁজিপতিরা ঠিক এটাই চায়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো ব্যবহার করে, দেশের মেধা করায়ত্ত করে তারা নিজেদের লাভের রাস্তা প্রশস্ত করবে।

ছাত্র-সংগঠন এআইডিএসও এবং অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি, ইন্ডিয়া মার্চ ফর সায়েন্স অর্গানাইজিং কমিটি সহ বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন দাবি করেছে শিক্ষাখাতে জিডিপি-র ৬ শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে। এই দাবিতে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, জেএনইউ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, র‍্যাভেনশ' বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, এমডিইউ (হরিয়ানা) সহ দেশের অগ্রগণ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে গবেষক তথা ছাত্রছাত্রীরা দিল্লিতে দশম ছাত্র সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবে।

অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র

দশম সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন

উদ্বোধক ঃ ইরফান হাবিব, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ
প্রধান অতিথি ঃ অধ্যাপক চমনলাল, বিশিষ্ট লেখক
বিশেষ অতিথি ঃ অরুণ কুমার সিং, প্রাক্তন সভাপতি, এআইডিএসও
বক্তা ঃ ভি এন রাজশেখর, সভাপতি, এআইডিএসও
সভাপতি ঃ সৌরভ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক, এআইডিএসও
সমাপ্তি অধিবেশনে বক্তা ঃ প্রভাস ঘোষ
প্রথম সাধারণ সম্পাদক, এআইডিএসও, সাধারণ সম্পাদক এসইউসিআই(সি)

২৭-২৯ নভেম্বর
দিল্লি
তালকাটোরা স্টেডিয়াম

শিক্ষা বাঁচানোর দাবিতে ত্রিপুরায় কর্মশালা

২৭ অক্টোবর আগরতলা দক্ষিণী প্রেক্ষাগৃহে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির ত্রিপুরা রাজ্য শাখার পক্ষ থেকে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনলাইনে আলোচনা করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির

সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ডঃ মৃদুল দাস এবং ডঃ প্রদীপ মহাপাত্র। প্রাথমিক স্তর থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে শিক্ষার ভিত্তি গড়ে ওঠে, এই শিক্ষানীতি কী ভাবে তাকে ধ্বংস করে এক প্রকার যান্ত্রিক মানবজাতি গড়ে তুলবে এবং অপর দিকে শিক্ষার বেসরকারিকরণকে উৎসাহিত করবে— এই বিপজ্জনক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা হয়।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, এই শিক্ষানীতিতে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা (কেজি-১, কেজি-২, কেজি-৩ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি) অঙ্গনওয়াড়ির হাতে তুলে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি পড়ানো হবে না, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত কোনও সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম থাকবে না। এই শিক্ষানীতিতে মাল্টিপল এন্ট্রি এবং মাল্টিপল এক্সিট, মাল্টি ডিসিপ্লিনারি স্কিম চালু করে চিন্তার সংহতি নষ্ট করা হচ্ছে, ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী করা হচ্ছে, মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকবে না, তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স চার বছরের করা হচ্ছে। শিক্ষা হবে অনলাইনভিত্তিক। এর ফলে শিক্ষার বেসরকারিকরণের পথ প্রশস্ত করা হবে। শিক্ষার চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণ ঘটবে। এই নীতিতে ইতিহাসের সাম্প্রদায়িকীকরণ ও গেরুয়াকরণের পরিকল্পনা হচ্ছে। পৌরাণিক গল্পকে ইতিহাস হিসাবে চালানোর চক্রান্ত হচ্ছে, পাঠ্যসূচিতে জ্যোতিষশাস্ত্র, বাস্তুশাস্ত্র প্রভৃতি অপবিজ্ঞান ঢুকিয়ে বিজ্ঞান হিসাবে চালানো হচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতা বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন মিলন চক্রবর্তী এবং উদ্বোধনী ভাষণ দেন সংগঠনের ত্রিপুরা রাজ্য শাখার সহ সভাপতি হরকিশোর ভৌমিক।

ন্যায় বিচারের দাবিতে সিবিআই দফতর অভিযান

আর জি করে ডাক্তার-ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার তদন্ত দ্রুত শেষ করা, সমস্ত দোষীদের নাম চার্জশিটে যুক্ত করা, সরকার-প্রশাসন-ক্রিমিনাল দুষ্টচক্র সমূলে বিনষ্ট করা সহ বিভিন্ন দাবিতে ৪ নভেম্বর 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা'র ডাকে হাজার হাজার মহিলা সিবিআই দফতর ঘেরাও অভিযান করেন। করুণাময়ী থেকে সিবিআই দফতরে পৌঁছে এক প্রতিনিধিদল সিবিআই অ্যাসিস্ট্যান্ট এসপির হাতে ডেপুটেশন দেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন অধ্যাপিকা মৈত্রেয়ী বর্ধন রায়, বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক শতরূপা সান্যাল, অধ্যাপিকা শাশ্বতী ঘোষ, বিশিষ্ট চিকিৎসক নূপুর ব্যানার্জী, সমাজকর্মী ইসমত আরা খাতুন, সিস্টার ভাস্বতী মুখার্জী, আইনজীবী দেবযানী সেনগুপ্ত প্রমুখ। সঠিক তদন্ত করে সমস্ত দোষীদের নামে দ্রুত চার্জশিট দেওয়ার দাবি জানানো হয়।

মহিলা চিকিৎসককে হেনস্থার প্রতিবাদ কলকাতা সাবার্বান বাইক-ট্যাক্সি অপারেটার্স ইউনিয়নের

কলকাতার পূর্ব যাদবপুরে ১ নভেম্বর এক মহিলা জুনিয়র ডাক্তারকে এক অ্যাপ-বাইক চালক হেনস্থা করেন বলে অভিযোগ। ৩ নভেম্বর এআইইউটিইউসি অনুমোদিত কলকাতা সাবার্বান বাইক ট্যাক্সি অপারেটার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই হেনস্থার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। তদন্ত সাপেক্ষে দোষীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার দাবি প্রশাসনের কাছে জানায় সংগঠন। তাঁরা জানান, সাধারণ মানুষ ও নারীর নিরাপত্তা রক্ষায় তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

মধ্যপ্রদেশে এআইইউটিইউসি-র সম্মেলন

মধ্যপ্রদেশে এআইইউটিইউসি-র গুনা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২৩ অক্টোবর। শাস্ত্রী পার্ক থেকে শ্রমিকদের মিছিল শুরু হয়ে সম্মেলনস্থলে উপস্থিত হয়।

মিছিলে স্লোগান ওঠে— চার শ্রমকোড বাতিল করো, শ্রম-আইনগুলির উপর কুঠারাঘাত করা চলবে না, সরকারি ক্ষেত্রগুলির বেসরকারিকরণ করা চলবে না, আউটসোর্সিং বন্ধ করো ইত্যাদি। বিদ্যুৎ মণ্ডলের গেটে প্রকাশ্য সমাবেশে উপস্থিত শ্রমিকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা নরেন্দ্র ভদোদিয়া।

এরপর স্থানীয় প্রেম শ্রী পরিসরে প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রমিক নেতা সমর সিনহা। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রামাবতার শর্মা, মনীশ শ্রীবাস্তব, প্রদীপ আর বি প্রমুখ। অটো ইউনিয়ন, বিদ্যুৎ কর্মচারী পেনশনার্স সহ অন্যান্য ক্ষেত্র থেকেও শ্রমিক-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন থেকে নরেন্দ্র ভদোদিয়াকে সভাপতি, লোকেশ শর্মাকে সম্পাদক করে নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়।

আর জি করের চিকিৎসক-ছাত্রী খুনের তদন্ত দ্রুত শেষ করার দাবিতে ৩০ অক্টোবর জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের ডাকে সল্টলেকে মেডিকেল কাউন্সিল থেকে সিবিআই দপ্তর অভিযান। দীর্ঘ পথ ধরে হাঁটা এই মিছিলে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের পূর্বাঞ্চলীয় কনভেনশন

অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (আইকা)-র উদ্যোগে ২৮ অক্টোবর আসামের গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত পূর্বাঞ্চলীয় কনভেনশনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা। সংবাদ আটের পাতায়

১৯ অক্টোবর দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এআইডিএসও মৈপীঠ ইউনিটের উদ্যোগে দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাঠসামগ্রী দেওয়া হয়। তাদের হাতে স্কুল ব্যাগ, পেন, পেন্সিল বক্স তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কমরেড ঋতুপর্ণা প্রামাণিক ও জেলা কমিটির সদস্য কমরেড গৌতম সরদার প্রমুখ।

পাঠকের মতামত

ফি-বছরের জলযন্ত্রণা কবে নিরসন হবে?

কোলাঘাটের দেহাটি ও টোপা ড্রেনেজ, গাজই প্রভৃতি খাল সংলগ্ন এলাকার প্রায় ৫০টি গ্রাম সেপ্টেম্বরের নিম্নচাপে প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়েছিল। এলাকা থেকে মাত্র ৮-১০ কিমি দূরে কোলাঘাটে রূপনারায়ণ নদী থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় ফি বছর গ্রামগুলি জলবন্দী হয়ে পড়ছে। বর্ষার সময় কয়েক মাস ওই গ্রামগুলির জনজীবন কার্যত স্তব্ধ হয়ে থাকে। গ্রামীণ রাস্তাগুলি থাকে জলের তলায়। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বন্ধ থাকে। আমন ধানের চাষ নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি এলাকার প্রধান অর্থকরী ফসল ফুলচাষ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুকুর ডুবে গিয়ে মাছচাষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সবচেয়ে সমস্যায় পড়েন বয়স্ক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও প্রসূতি মায়েরা। অথচ দেহাটি, টোপা ড্রেনেজ, গাজই, দেনান প্রভৃতি কয়েকটি খাল ৭-৮ বছর অন্তর নিয়মিত সংস্কার, খালের ভেতরে অবৈধ নির্মাণ বন্ধ করলে এবং খাল ও মাঠের সাথে যুক্ত স্লুইস গেটগুলির মুখে জল আসার ক্ষেত্রে বাধাগুলি অপসারণ করলে এলাকার লক্ষাধিক মানুষ প্রায় প্রতি বছরের এই দুর্ভোগ থেকে রেহাই পেতেন। ১৯৪৭ সালের পর থেকে কেন্দ্রে একাধিক সরকার পাল্টেছে, রাজ্যের সরকারও পরিবর্তন হয়েছে, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েতের অনেক জনপ্রতিনিধিও পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু জনসাধারণের জলযন্ত্রণার এই সমস্যা থেকে মুক্তি ঘটেনি। এমনকি বর্তমানে এই এলাকা থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে একজন মন্ত্রীও রাজ্য মন্ত্রিসভায় আছেন। দুর্ভোগের সময় ওই সমস্ত জনপ্রতিনিধিদের হয়তো বা অল্প সময়ের জন্য দেখা মেলে। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছু হয় না। সমস্যা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থেকে যায়।

বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে একদিকে কেন্দ্রের সরকার চাঁদে মানুষ পাঠানোর জন্য জনগণের ট্যাক্সের কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। অন্য দিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে নাকি আর উন্নয়নের কোনও কাজ বাকি নেই বলে ঘোষণা করছেন। অথচ প্রত্যেক বছর জনসাধারণের ওই চরম দুর্ভোগের পাশাপাশি কোটি কোটি টাকার সম্পদহানিও ঘটে চলেছে।

চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ নিম্নচাপজনিত প্রবল বর্ষণে উপরোক্ত এলাকা জলমগ্ন হওয়ার পর অক্টোবর মাসে খানিকটা জলস্তর কমেছিল। তারপর ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে আবার একই রকম পরিস্থিতি হয়েছে। সিদ্ধা-১, বৃন্দাবনচক, পুলশিটা, সাগরবাড়, খন্যাডিহি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় ২০-২৫ টি গ্রামের রাস্তায় হাঁটু সমান জল দীর্ঘ দিন জমে থেকেছে। এলাকায় সমস্ত আবর্জনা পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। কিন্তু ওই খালগুলি মজে থাকার কারণে ও পানশিলায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর দেহাটি ব্রীজের নীচে জলনিকাশিতে বাধাসৃষ্টিকারী কাঠামো অপসারণ না হওয়ায় বর্তমানে ওই জমা জল বের হচ্ছে খুব ধীর গতিতে। দেহাটি লকগেটের ফ্ল্যাপ (নদীর দিকে থাকা ঝাঁপ) সাটারগুলি সর্বক্ষণের জন্য তোলা ও গিয়ার সাটারগুলি প্রত্যহ জোয়ারের সময় তোলা ও ফেলার বন্দোবস্ত করলে জমা জল খানিকটা দ্রুততার সাথে রূপনারায়ণে বের হতে পারত। প্রশাসনকে ওই প্রস্তাব দেওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত তা কার্যকর করার কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

অবিলম্বে জমা জল দ্রুত বের করার জন্য জরুরিভিত্তিতে প্রশাসন ও সেচ দপ্তর যাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেই দাবি রাখছি। পাশাপাশি এলাকার সমস্যার স্থায়ী সমাধানে অতি সত্বর উপযুক্ত ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করুক এই দাবি রাখছি।

নারায়ণ চন্দ্র নায়ক
কৃষক সংগ্রাম পরিষদ, পূর্ব মেদিনীপুর

সমাজতন্ত্র বেকার সমস্যা দূর করেছিল

একের পাতার পর

এবং পুঁজিবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হল। পুঁজিবাদ নিজেই তার সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে। এ কথা যাঁরা বলেছিলেন, সেইসব পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদ বুদ্ধিজীবীরা আজ অস্বীকার করতে পারছেন না যে দিনে দিনে সমস্যার গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজ।

কী পরিস্থিতি আজ ভারতের! দেখা যাচ্ছে, ২০১৫ সালে ভারতে কর্মক্ষম মানুষের (যাদের বয়স ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে) সংখ্যা ছিল ৯৫ কোটির কিছু বেশি। ওই একই সময় দেশের শ্রমশক্তি অর্থাৎ কর্মরত বা কাজ-খোঁজা মানুষের সংখ্যা ছিল ৪৮ কোটি। ২০২১ সালে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১১৫ কোটি ও ৪২ কোটিতে। অর্থাৎ ওই সময়ে প্রয়োজনীয় নতুন পদ বা চাকরি সৃষ্টি তো হয়ইনি, বরং ছ'কোটি মানুষের কাজ চলে গেছে। কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা দেশে ক্রমাগত বাড়ছে। ২০১৭-'১৮ সালেই দেশে বেকারত্বের হার গত ৪৫ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিই বেকার সমস্যার কারণ

শুধু কি সরকারের সদিচ্ছার কারণেই বেকার সমস্যা আজ এই ভয়াবহ চেহারা নিয়েছে? বিশ্ব সাম্যবাদের দিশারি মহান মার্ক্স দেখালেন, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য শ্রমিককে যে শোষণ করে, সেটাই এক দিকে তার টিকে থাকার শর্ত, অন্য দিকে এই শোষণই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বার বার সংকটের আবর্তে টেনে নিয়ে যায়। জন্ম দেয় ভয়াবহ বেকার সমস্যার। তিনি দেখিয়েছেন, শ্রমিকের শ্রম চুরি করেই (উদ্বৃত্ত শ্রম) হয় মালিকের লাভ বা উদ্বৃত্ত মূল্য। উদ্বৃত্ত মূল্য যত বাড়ে লাভও তত বাড়ে। মহান নভেম্বর বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিন 'গ্রামের গরিবদের প্রতি' শীর্ষক এক আলোচনায় দেখিয়েছেন, এই উদ্বৃত্ত মূল্য মালিক মূলত চারটি উপায়ে বাড়ায়— (১) কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়ে, (২) উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে, (৩) কাজের সময় বাড়িয়ে এবং (৪) মজুরি কমিয়ে। শোষণ তীব্রতর করে মালিকের মুনাফার বহর বাড়লে মজুরের জীবনে দারিদ্র্য বাড়ে, বাড়ে বেকারত্ব, কমে চাকরির নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব। ফলে ধীরে ধীরে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমতে থাকে। বাজারে বিক্রি কমে। ব্যবসায় সংকট আরম্ভ হয়। এই সংকট থেকে বাঁচতে আবার উপরে উল্লেখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এইভাবে পুঁজিবাদ এক সংকট থেকে বাঁচতে আর এক গভীর সংকটে পড়ে। যেটা সে সমাধান করতে পারে না, সংকট ক্রমাগত তীব্রতর হয়। উপরন্তু উন্নত বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সাহায্যে ক্ষমতাসম্পন্ন উৎপাদন যন্ত্রের ব্যবহারে বৃহৎ পুঁজি প্রতিযোগিতাকে তীব্রতর করে, উৎপাদন খরচ কমিয়ে ছোট ও মাঝারি পুঁজিকে ধ্বংস করে। এদের উপর নির্ভরশীল মানুষ কর্মচ্যুত হয়। ফলে বাজার সংকট আরও বাড়ে। এর সঙ্গে তাল রেখে বাড়ে বেকার বাহিনী।

একদিকে উৎপাদনের ক্ষমতার সীমাহীন বৃদ্ধি, অন্যদিকে জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশের ক্রয়ক্ষমতার অবনতি— এই দুইয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে যা ঘটে তা দেখাতে গিয়ে লিয়নটিয়েফ তাঁর 'মার্ক্সীয় অর্থনীতি' বইয়ে একটা বাস্তব চিত্র তুলে ধরলেন। সেটি হল ঃ

"এক খনি মজুরের ছেলে তার মা'কে জিজ্ঞাসা করছে,
'আগুন জ্বলছে না কেন মা, বড়ো ঠান্ডা যে?'
— আমাদের কয়লা নেই বাবা।
— কেন কয়লা নেই মা?
— তোমার বাবা যে বেকার, তাই আমাদের কয়লা কেনার টাকা নেই।
— কিন্তু বাবার চাকরি কেন নেই মা?
— অনেক কয়লা মজুত রয়েছে যে বাবা।"

এই হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ৭৫ বছরের পুঁজিবাদী শাসনে ভারতবর্ষের পরিস্থিতিটা অদ্ভুত ভাবে মিলে যায়। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদনের উদ্দেশ্য হল সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। তাই এই অর্থনীতির সামগ্রিক পরিকল্পনা রচিত হয় কীভাবে মুনাফার হার আরও বাড়ানো যায় সে দিকে লক্ষ রেখে। তাই পৃথিবীর সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে বেকার সমস্যা ক্রমাগত বাড়তেই থেকেছে। নব্বইয়ের দশকে বিশ্বায়নের নয়া আর্থিক নীতি আসার পর মালিকী শোষণের হার বাড়তে থাকে, শ্রমিক শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ইঞ্জিন বলে কথিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকার সমস্যা এমন ভয়াবহ যে, আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ময়দানে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে কখনও সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ভরতুকি, খাদ্য কুপন ইত্যাদি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে হচ্ছে। অভিবাসীদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে বেকারদের শান্ত করতে হচ্ছে। সারা বিশ্বে সরকারি বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে যন্ত্রীকরণ হচ্ছে, চলছে ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাই, বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কাজের সময়। ফলে মালিকের মুনাফা বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে বেকার বাহিনী। মহান মার্ক্সবাদী দার্শনিক শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন— আজ পুঁজিবাদের অবাধ বিকাশের আর সম্ভাবনা নেই। এর মধ্যে শিল্প কিছু হচ্ছে না বা বাজার অল্পবিস্তর সম্প্রসারণ হচ্ছে না এমন নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার বাজার সংকট দেখা দিচ্ছে। পাঁচটা কারখানা হচ্ছে তো দশটা বন্ধ হচ্ছে। যতটুকু উৎপাদিকা শক্তি রয়েছে তারও পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না। চলছে ছাঁটাই, লে-অফ-লকআউট-ক্লোজার। পুঁজিবাদী নিয়ম মেনে উৎপাদন বাড়তি হয়ে যাচ্ছে। গুদামে পণ্য জমে যাচ্ছে। সমস্ত দেশেই মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অভাব। পণ্য বিক্রির বাজার নেই। ফলে বাজার সম্প্রসারণ তো দূরের কথা তা আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। এই অবস্থায় ব্যাপক শিল্পায়ন করে কর্মসংস্থান সম্ভব নয়। ফলে বেকার বাড়ছে হু হু করে।

নভেম্বর বিপ্লবের আগে রাশিয়ার অবস্থা

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে রাশিয়ার পরিস্থিতিও একই রকম ভয়ঙ্কর ছিল। গরিব চাষি, শ্রমিক সহ বৃহত্তর অংশের জনগণ দ্রুত ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। হাজার হাজার দারিদ্র্যপীড়িত অসহায় গ্রামীণ কৃষক ভিড় করছিল শহরে কাজের খোঁজে। তীর্থের কাকের মতো একটা কাজের আশায় ঘন্টার পর ঘন্টা হয় তারা কারখানার গেটে দাঁড়িয়ে থাকত আর না হয় বাজারে অথবা বড়লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াত যে কোনও শর্তে যে কোনও ধরনের কাজের জন্য। পুঁজিবাদের সবচেয়ে ভালো সময় রাশিয়ার প্রধান শিল্পকেন্দ্রগুলিতে বেকার সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ। গ্রামীণ বেকার, অর্ধবেকারদের বিপুল সংখ্যা ছিল এর বাইরে। লক্ষ লক্ষ মানুষ

সাতের পাতায় দেখুন

চরম দারিদ্রে ১১০ কোটি

দুয়ের পাতার পর

ঘটছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘরবাড়ি হারাচ্ছেন, পৃথিবী জুড়ে জীবন ও সম্পদের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে', বলেছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের ওই সংস্থার এক সচিব। সবকিছু জানার পরেও তাহলে যুদ্ধ কেন? কেন ইউএনও, ইউনিসেফের মতো সংস্থার নাকের ডগা দিয়ে বছরের পর বছর চলতে পারছে ইউক্রেন এবং প্যালেস্টাইনের ওপর এই প্রাণঘাতী হামলা? কোন অপরাধে প্যালেস্টাইনের হাজার হাজার নারী, ফুলের মতো শিশু শেষ হয়ে যাচ্ছে বোমার আঘাতে? ইজরায়েলের রাষ্ট্রপ্রধানরা প্যালেস্টাইনের মানুষদের সম্পর্কে চরম অবমাননাকর উক্তি করেও পার পেয়ে যাচ্ছেন কী করে? আমাদের ভারতবর্ষ কার স্বার্থে খুনি ইজরায়েলের সাথে সুসম্পর্ক রেখে চলছে?

একদিকে যখন বেকারি, অনাহার, দারিদ্র, শিশুমৃত্যু ক্রমশ বাড়ছে তখন আমাদের দেশে আম্বানি-আদানির মতো শিল্পপতিরা 'অর্থনীতির সুবাতাস' অনুভব করে প্রীত হচ্ছেন। ভারত সহ পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের শাসকরা একের পর এক যুদ্ধ বাধিয়ে গণহত্যা করছে কোনও দেশরক্ষার স্বার্থে নয়, মুমূর্ষু পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে যুদ্ধের বাজারের টোটকা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। একদিন যে গণতন্ত্রে 'জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য এবং জনগণের' হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি ছিল, একের পর এক সমীক্ষা, তথ্য, পরিসংখ্যান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে আজকের পুঁজিবাদী বিশ্বের 'গণতন্ত্রে', সেই জনগণের তিলমাত্র স্থান নেই, অধিকার নেই।

মুনাফা শিকারে ব্যস্ত ভারতীয় পুঁজিও

তিনের পাতার পর

পুঁজিপতি শ্রেণির এই ভূমিকার বিরুদ্ধে বিপুল ক্ষোভ আছে। সম্প্রতি আফ্রিকার কেনিয়ায় আদানি গোষ্ঠীর লগ্নির বিরুদ্ধে সে দেশের মানুষের ক্ষোভের কথা সামনে এসেছে। একচেটিয়া সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির এই আধিপত্যের চেষ্টার সাথে ভারতীয় জনগণের উন্নতি কিংবা গর্বের কোনও সম্পর্ক নেই। টাটা-রিলায়েন্স-আদানিদের বিদেশি লগ্নি ভারতীয় জনগণের জীবনে সমৃদ্ধি আনে না। বরং ভারতীয় শাসক শ্রেণির এই প্রতিভূরা তাদের তাঁবেদার সরকারের সাহায্যে ভারতের জনগণকেও তীব্র শোষণে ছিবড়ে করে দেয়। অন্যদিকে তারা যুদ্ধ থেকেও মুনাফা তোলে। জানা যাচ্ছে যুদ্ধের ফলে রাশিয়ার ওপর আমেরিকা, ইউরোপের নিষেধাজ্ঞা থাকার ফলে ভারতীয় কোম্পানিগুলো অতি সস্তায় রাশিয়া থেকে যে তেল আমদানি করেছে তা শোধনের পর চড়া দামে ইউরোপের বাজারেই বেচে আরবের তেল মার্চেন্টদের সম্মিলিত লাভের থেকেও বেশি কামিয়েছে। কিন্তু এর জন্য ভারতীয় জনগণের কী লাভটা হয়েছে? তারা কি সস্তায় তেল পেয়েছে? রিলায়েন্স-এসার-আদানিদের লাভের ফলে কি দেশের মানুষের রোজগার বেড়েছে বা কর্মসংস্থানের কোনও সুরাহা হয়েছে? কিছুই হয়নি। বরং মূল্যবৃদ্ধির বোঝা মানুষের জীবন জেরবার করে দিচ্ছে, বেকারত্ব বাড়ছে, অতি সামান্য মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে অধিকাংশ ভারতীয় শ্রমিক। নরেন্দ্র মোদি সাহেবের নিজভূমি গুজরাট থেকেই কাজের সন্ধানে হাজার হাজার মানুষ আমেরিকার সীমান্ত বেআইনিভাবে পেরোতে গিয়ে ধরা পড়ছেন। ইজরায়েলে, রাশিয়াতে যুদ্ধের বিপদের কথা জেনেও ভারতীয় শ্রমিকরা একটু বাড়তি বেতনের আশায় ছুটছেন। ভারত আজ মানব পাচারের অন্যতম হটস্পট বলে চিহ্নিত। এ দেশের অসহায় যুবক-যুবতীরা পাচারকারীদের সহজ শিকার।

মোদিজি যে শান্তির বাণী শুনিয়েছেন, তা অন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে ভারতীয় একচেটিয়া মালিকদের আপাত শান্তির সাথে যুক্ত। দেশের জনগণের জীবনে শান্তি এনে দেওয়ার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের বিপুল অগ্রগতি

সারা বিশ্বের মানুষকে আকৃষ্ট করে

ছয়ের পাতার পর

কাজের খোঁজে অন্য দেশে চলে যাচ্ছিল। এই বেকার বাহিনীর বাইরে জমিতে বাঁধা ছিল প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ, যাদের শ্রম দানের অন্য কোনও জায়গা ছিল না। ফলন মার খাওয়ায় প্রায় ৩ কোটি মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছিল।

১৯১৭ সালের নভেম্বরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে অবস্থা আরও করুণ হয়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কা, শিশু সোভিয়েতকে খতম করতে চোদ্দটি রাষ্ট্রের যৌথ আক্রমণ ইত্যাদির কারণে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। কৃষিক্ষেত্র বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বেকার সমস্যা ভয়াবহ রূপ নেয়। ১৯১৮ সালে রাশিয়ায় নথিভুক্ত বেকার ছিল ১৫ লক্ষ ১২ হাজার ৪৫৫ জন। কাজ পাওয়া অসম্ভব ভেবে জনগণের একটা বড় অংশ নাম নথিভুক্ত করাত না। এই সমস্ত কিছু সামলে মহান লেনিনের নেতৃত্বে শুরু হল বিপর্যস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনের কাজ।

যেভাবে সমাজতন্ত্র দূর করেছিল বেকার সমস্যা

সমাজতন্ত্র উৎপাদন যন্ত্রের উপর ব্যক্তি মালিকানার অবসান ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে চলে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের লক্ষ্য ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন নয়, ক্রমাগত উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে দেশের প্রতিটি মানুষের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন পূরণ করা। কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং কমিশন দেশের মোট উৎপাদিত কাঁচামাল, মোট শ্রমিকের সংখ্যা, ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা, উৎপাদন যন্ত্রের পরিমাণ হিসাব করে তারপর পূর্ববর্তী বছরে বা বছরগুলিতে কোন জিনিস কী পরিমাণে তৈরি হয়েছিল, কোন জিনিসের চাহিদা কেমন, আগামী দিনে কোন কোন দ্রব্য কতটা পরিমাণে প্রয়োজন হতে পারে ইত্যাদি সব কিছুর ভিত্তিতে একটা খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করত। এরপর সেই খসড়া পরিকল্পনাকে ভিত্তি করে তৃণমূল স্তর থেকে সমগ্র দেশকে, দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা, মত-বিনিময়, সে সবের সংযোজন-বিয়োজন করে তৈরি হত মূল পরিকল্পনা। আইনসভা সেই পরিকল্পনা অনুমোদন করার পর তা কার্যকর হত। এর চেয়ে বড় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বিশ্বে কোনও পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নিতে পারেনি তাই সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতে প্রতিটি পরিকল্পনা হয়ে উঠত জনগণের নিজের বিষয় আর তাই তার রূপায়ণ হত নির্দিষ্ট সময়ের আগেই। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের বিপুল অগ্রগতি সারা বিশ্বের মানুষকে আকর্ষণ করে। বেশ কিছু পুঁজিবাদী দেশের শাসকরা এই আকর্ষণ দেখে আতঙ্কিত হয়ে 'পরিকল্পিত' অর্থনীতির কথা বলতে থাকে। না হলে নিজের দেশে সামাজতন্ত্রের জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাড়বে। সে জন্য ভারতেও স্বাধীনতার পর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা আসে। কিন্তু তা যেহেতু পরিচালিত হত পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়ম ও লক্ষ্য অনুযায়ী, তাই পুঁজিপতিদের মুনাফা বৃদ্ধি ছাড়া দেশের সার্বিক বিকাশের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারেনি কোনও পরিকল্পনাই। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় যে সব গোলমাল দেখা যায়, পরিকল্পিত অর্থনীতির জন্য সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সোভিয়েত রাশিয়াতে তা দেখা যায়নি। সম্পদ যা তৈরি হত তার একটা অংশ শিক্ষা, চিকিৎসা, উৎপাদন যন্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি, রাস্তাঘাট তৈরি সহ সরকার চালাবার অন্যান্য বিষয়ে ব্যয় করে বাকিটা জনসাধারণের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হত। এ জন্য সমাজতন্ত্রে কখনও জিনিস বিক্রি না হয়ে পড়ে থাকত না। একই ভাবে না খেতে পেয়ে বা বিনা চিকিৎসায় মানুষ মারাও যেত না।

শ্রমিকদের সঙ্গে কমরেড লেনিন

সামাজিক মালিকানা ও জনগণের প্রয়োজনের ভিত্তিতে উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পিত অর্থনীতি প্রয়োগের কারণে কখনও বাজার সংকট দেখা দিত না, শ্রমিকও কখনও বেকার হত না। এ জন্যই ১৯২৯-৩৩ এই সময়কালে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে যখন প্রবল বাজারসঙ্কট চলছে, চলছে লে-অফ, লকআউট, শত শত কারখানা বন্ধ হচ্ছে, তখন সোভিয়েত রাশিয়ার মানুষ দিনরাত কাজ করেও গোটা দেশের জনগণের চাহিদা মেটাবার প্রয়োজনে উৎপাদন আরও বাড়িয়ে চলেছিল। একটার পর একটা নতুন কারখানা খোলার প্রয়োজন তখন তাদের সামনে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সর্বোচ্চ মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় বলে যন্ত্রের ব্যবহারে ছাঁটাই শ্রমিক আর বেকারের সংখ্যা বাড়ে। পুঁজিবাদে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় মূলত উৎপাদন খরচ কমানোর লক্ষ্যে। তাই যত প্রযুক্তি আসে, তত শ্রমিকের দুর্দশা বাড়ে। উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়লেও বাস্তবে উৎপাদন ক্রমাগত বাড়তে পারে না। কারণ বাজারে চাহিদা না থাকায় আগে উৎপাদিত হওয়া পণ্য জমে থাকে। ফলে মুনাফা কমার আশঙ্কায় মালিকরা শ্রমিক ছাঁটাই করে।

এর ঠিক বিপরীত হচ্ছে সমাজতন্ত্র, যেখানে প্রযুক্তি কাজে লাগে উৎপাদন বাড়াতে, মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে। ফলে কর্মসংস্থান বেড়েই চলে। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সেই প্রযুক্তি শ্রমিকের শ্রমই শুধু লাঘব করেনি সাথে সাথে শ্রম সময় হ্রাস করেছে। বিপ্লবের মাত্র ছয় বছর পর ১৯২৩ সালে শ্রমসময় কমে হয়ে গিয়েছিল দিনে ৭ ঘণ্টা এবং এরপর ১৯৩৭-এ ৫ ঘণ্টা। ফলে কারখানায় শিফট বাড়ল, কর্মসংস্থান বাড়ল মজুরি বৃদ্ধি পেল। এভাবেই যে সময়ে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় বেকার সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল, সেই সময়ে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় শ্রমিকের অভাবে কারখানা আর বাড়ানো যাচ্ছিল না। ১৯৩১-এর মধ্যে বেকার সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করে ফেলেছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন।

সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের মালিকানা থাকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সর্বহারা শ্রেণির হাতে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মতো জনকয়েক পুঁজিপতির হাতে নয়। তাই কয়েক শতক ধরে পুঁজিবাদ যে সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, ভারতে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরে যে সমস্যা ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়েছে, সেই বেকার সমস্যা বিপ্লবের মাত্র ১২ বছরের মধ্যে সমাজ থেকে দূর করে ফেলেছিল সোভিয়েত সমাজতন্ত্র। ফলে, মালিকের মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যত দিন টিকে থাকবে, সমাজের আর পাঁচটা অন্যান্য সমস্যার মতো বেকার সমস্যাও বাড়তেই থাকবে। এর মধ্যে কাজের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হলে, শূন্যপদে নিয়োগে সরকারকে বাধ্য করতে না পারলে বাঁচার কোনও পথ নেই। আর তার জন্য প্রয়োজন দেশজোড়া তীব্র গণআন্দোলন যা পরিচালিত করতে হবে শুধুমাত্র চাকরির দাবি আদায়ের লক্ষ্যে নয়, এই শোষণমূলক ব্যবস্থাকে উৎখাতের লক্ষ্যেও।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 13 Bengali Weekly November 8, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের পূর্বাঞ্চলীয় কনভেনশনে

স্মার্ট মিটার চালুর বিরুদ্ধে দেশজোড়া আন্দোলনের ডাক

বৃহৎ কর্পোরেট গোষ্ঠীর স্বার্থে সম্পূর্ণ জনবিরোধী প্রিপেড স্মার্ট মিটার চালুর বিরুদ্ধে অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (আইকা)-র উদ্যোগে পূর্বাঞ্চলীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় আসামে। ২৮ অক্টোবর গুয়াহাটি জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে আসাম সহ পূর্ব ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, ত্রিপুরা ইত্যাদি রাজ্য থেকে সহস্রাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক উপস্থিত ছিলেন এই কনভেনশনে। স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে গ্রাহকদের ক্ষোভ এতটাই তীব্র যে, আসামের দুটি রুটে ওই দিন সমস্ত ট্রেন বাতিল হওয়া সত্ত্বেও কয়েক শত বিদ্যুৎ গ্রাহক অনেক প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে কনভেনশনে উপস্থিত হন।

সভাপতিত্ব করেন আইকা-র সর্বভারতীয় সভাপতি স্বপন ঘোষ। উদ্বোধন করেন আসাম পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড(এপিডিসিএল) -এর অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার তথা বিদ্যুৎ আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিমল দাস। তিনি বলেন, গৃহস্থ গ্রাহকের ঘরে রিচার্জ পদ্ধতিতে মিটার স্থাপন জনবিরোধী। সরকার কোনও পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই স্মার্ট মিটার সংযোগ করছে। এটা বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-কে লঙ্ঘন করছে।

আমন্ত্রিত বক্তা, শিলং-এর সেন্ট এডমন্ড কলেজের ইলেকট্রনিক্স বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ওয়াল্ডেল পাশা বলেন, ভারতে ৬০ শতাংশ মানুষের কাছে এখনও স্মার্ট ফোন নেই, প্রত্যন্ত অঞ্চলে নেটওয়ার্ক নেই, তখন এই স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা মানুষকে বিপাকে ফেলবে। তিনি বলেন, যেসব দেশে স্মার্ট মিটার লাগানো হয়েছে, সেখানে মানুষের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। ভারত সরকারের এই স্মার্ট মিটার প্রকল্প বাতিল করার জন্য তিনি দাবি জানান।

সভাপতি স্বপন ঘোষ বলেন,স্মার্ট মিটার সংযোজনের সাথে সাধারণ মানুষের স্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই। এটা করা হচ্ছে বৃহৎ কর্পোরেট গোষ্ঠীর মুনাফার স্বার্থে। একচেটিয়া পুঁজিপতিরা দেশের বন, জল, জঙ্গল, প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন কুক্ষিগত করছে তেমনি এখন বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকেও নিজেদের দখলে নিতে চাইছে। এদের স্বার্থেই সরকার বিদ্যুতের বেসরকারিকরণের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে তুলেছে। সরকারের এই চক্রান্ত সফল হলে দেশের সাধারণ গরিব মানুষ মারাত্মক ভাবে পুঁজিপতিদের শোষণের মুখে পড়বেন। অত্যন্ত চড়া দামে মানুষকে বিদ্যুৎ কিনতে বাধ্য করবে বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীরা। এর বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে ঐক্যবদ্ধ গ্রাহক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

কনভেনশনের সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান ভারত সরকারের শক্তি বিভাগের প্রাক্তন সচিব এ এস শর্মা, অল ইন্ডিয়া পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ার ফেডারেশনের অধ্যক্ষ শৈলেন্দ্র দুবে, অল ইন্ডিয়া ফোরাম এগেইনস্ট প্রাইভেটাইজেশনের অধ্যক্ষ ডঃ এ ম্যাথু এবং আইকার সাধারণ সম্পাদক কে ভেনুগোপাল ভাট।

মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ অজয় চ্যাটার্জী। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অল ইন্ডিয়া পাওয়ার মেনস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সমর সিনহা, ইয়ুথ এগেইনস্ট সোসাল ইভিল-এর সভাপতি সঞ্জীব রায়। তা ছাড়া বক্তব্য রাখেন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস, অল আসাম ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক অজয় আচার্য সহ সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির বিদ্যুৎ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। শেষে সমগ্র দেশে বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলন শক্তিশালী করা এবং জেলায় জেলায়, অঞ্চলে অঞ্চলে বিদ্যুৎ গ্রাহক কমিটি গড়ে তোলার অঙ্গীকার নেন গ্রাহক প্রতিনিধিরা।

এ আই ডি এস ও-র উদ্যোগে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় দীপাবলি উৎসবের সময় বুকস্টল করা হয়। ছবি ঃ দক্ষিণ কলকাতা

প্রকাশিত হয়েছে

মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক
কমরেড শিবদাস ঘোষের
শিক্ষার সঙ্গে একাত্ম হয়ে
পুঁজিবাদ উচ্ছেদের বিপ্লবে সামিল হোন

অসিত ভট্টাচার্য

সংগ্রহ করুন

মালিক শ্রেণির নির্মম শোষণ এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী নীতি ও পদক্ষেপের বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী করতে

সংগ্রামী শ্রমিক সংগঠন
AIUTUC - র
২৩তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য
সম্মেলন

১৫-১৬ নভেম্বর ● শিলিগুড়ি

বক্তা - কমরেড স্বপন ঘোষ
সহসভাপতি, সর্বভারতীয় কমিটি
কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত
সাধারণ সম্পাদক সর্বভারতীয় কমিটি

বোমা বিস্ফোরণে কিশোর আহত
পাটুলি থানায় স্মারকলিপি

কলকাতায় পাটুলি থানার কাছে মেলার মাঠ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে বোমা উদ্ধারের ঘটনা এবং বোমা বিস্ফোরণে এক কিশোরের আহত হওয়ার প্রতিবাদে দলের যাদবপুর আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে ৩ নভেম্বর পাটুলি থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মেলার মাঠ থানা থেকে ১০০ মিটার দূরত্বে। ওই মাঠে সকালে অসংখ্য মানুষ প্রাতঃভ্রমণ করেন, বিকেলে ছেলেরা খেলাধূলা করে। সারাদিন অসংখ্য মানুষের জমায়েত থাকে। এরকম একটা ব্যস্ত জায়গায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় এলাকার মানুষের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ডেপুটেশনে দাবি করা হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দোষীদের শাস্তি দিতে হবে এবং এলাকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

এসইউসিআই(সি)-র নতুন ওয়েবসাইট - sucic.org

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com